প্রথম আলো

বাংলাদেশ

বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন, এখন

রাজীব আহমেদ ঢাকা

আপডেট: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০১: ৩০

মুক্তি ও গণতন্ত্র তোরণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় *ফাইল ছবি*

শুরু করলাম নিজের কক্ষটি দিয়ে, যে কক্ষে আমি ২০০৯ সাল পর্যন্ত পাঁচটি বছর কাটিয়েছি। কক্ষটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলে, ১১৩ নম্বর। গতকাল সোমবার গিয়ে দেখলাম কক্ষটি তালাবদ্ধ। আশপাশের আরও কয়েকটি কক্ষেও তালা।

জানালার ভাঙা কাচের ফাঁক দিয়ে দেখলাম, কক্ষটিতে কয়েকটি খাট, টেবিল ও চেয়ার আছে। তবে খাটে কোনো তোশক নেই, চাদর নেই, বালিশ নেই। টেবিলে বই নেই, খাতা নেই। ধুলা পড়ে আছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ১১৩ নম্বরসহ বঙ্গবন্ধু হলের মূল ভবনের নিচতলার গণরুমগুলো এখন আর ব্যবহৃত হয় না। পাশে আরেকটি ভবন হয়েছে, নাম জুলাই শহীদ স্মৃতি ভবন। ফলে হলে আবাসনসংকট নেই। আর গণরুমপ্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। এখন চারজনের কক্ষে চারজন করে থাকেন। এক খাটে দুজনকে ঘুমাতে হয় না। অন্য হলেও মোটামুটি একই চিত্র।

মনে পড়ল, আমাদের চারজনের কক্ষটিতে চারটি খাটে আমরা আটজন ঘুমাতাম। মেঝেতে কখনো চারজন, কখনো ছয়জন থাকতেন। ১১৩ নম্বর কক্ষটি গণরুম নামে পরিচিত ছিল। হল নিয়ন্ত্রণ করত তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল বিএনপির ছাত্রসংগঠন ছাত্রদল (তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় ছাত্রলীগ হলে ছিল, তবে তাদের হাতে নিয়ন্ত্রণ ছিল না)।

যাঁরা জানেন না, তাঁদের উদ্দেশে বলি, গণরুম হলো যে কক্ষে একসঙ্গে অনেক শিক্ষার্থী থাকতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের গণরুমে তুলতেন ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নেতারা। পাশাপাশি জ্যেষ্ঠদের মধ্যে নিরীহ কাউকে কাউকে গণরুমে থাকতে হতো। আমাদের কক্ষে ছিলেন স্নাতকোত্তরের দুজন শিক্ষার্থী।

হলে একজন ছাত্রের জন্য একটি খাট দেওয়া হয়, যা ৩৩ ইঞ্চি চওড়া। এই ৩৩ ইঞ্চিতে আমরা দুজন ঘুমাতাম। সারা রাত এক পাশ ফিরে শুতে হতো, চিত হওয়ার সুযোগ নেই। এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ বেশি হওয়ায় হলের আসন বিতরণের তালিকায় আমার নামটি সবার ওপরে ছিল। আমি বেছে নিয়েছিলাম ২০৩ নম্বর কক্ষ। কিন্তু সেখানে কোনো দিন উঠতে পারিনি। কক্ষটিতে থাকতেন ছাত্রদলের একজন নেতা ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা।

২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা হল ছাড়লেন। দখলদারি গেল ছাত্রলীগের হাতে। গত বছর জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিতাড়ন করার আগপর্যন্ত ছাত্রলীগ হলে তাদের দখলদারি বজায় রেখেছিল। আমি দেখেছি, হলের সিঁড়িতে, ছাদে, মসজিদে থাকতেন গ্রাম থেকে আসা অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা; হলের অতিথিকক্ষে আদবকায়দা শেখানোর নামে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শিক্ষার্থীদের কীভাবে মানসিক নিপীড়ন করা হতো, মারধর করা হতো; বন্ধুর বিরুদ্ধে বন্ধুকে রামদা হাতে মারামারিতে নামিয়ে দেওয়া হতো। আমি দেখেছি, গভীর রাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কীভাবে রাতবিরাতে ক্যাম্পাসে দল বেঁধে পাঠানো হতো একসঙ্গে বসে থাকা ছেলে-মেয়ে অথবা বহিরাগতদের হেনস্তা করতে।

এসব সুদূর অতীত নয়, নিকট অতীত। ঘটত গত বছরের জুলাইয়ের আগেও। এখন নেই বললেই চলে। এই পরিবর্তনকে এক শব্দে কী বলবেন, জানতে চেয়েছিলাম ব্যাংকিং ও ইনস্যুরেন্স বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী হাসিবুল হাসানের কাছে। তিনি বললেন, ‘অ্যামেজিং (দারুণ)।’

হাসিবুল নিজে যখন হলে উঠেছেন, তখন এক কক্ষে ৪০-৪৫ জন থাকতেন। তাঁকেও গেস্টরুমে যেতে হয়েছে, গভীর রাতে হল থেকে দল বেঁধে বের করে অন্যদের হেনস্তা করতে যেতে বলা হতো। তিনি বললেন, ‘সাত বছর ক্যাম্পাসে আছি। এখনকার মতো পরিবেশ পাইনি।’

ডাকসু ভোট

গণরুম-গেস্টরুম সংস্কৃতি না থাকলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্যা শেষ হয়ে যায়নি। হলে এখনো নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয়; নিরাপত্তার সমস্যা রয়েছে, বিশেষ করে ছাত্রীদের; নারী শিক্ষার্থীদের আবাসনসংকট রয়েছে, অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের খণ্ডকালীন কর্মসংস্থান দরকার, পরিবহন-সুবিধা বাড়ানো দরকার। সমস্যা আরও আছে।

এসব সমস্যাকে সামনে রেখে আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদের নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। আগের ২০১৯ সালের নির্বাচন ছিল বিতর্কিত। তারও আগে ভোট হয়েছিল ১৯৯০ সালে।

আশির দশকে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল বড়। সেই ছাত্ররা দেখলেন, এরশাদের পতনের পর গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন হলো ঠিকই, কিন্তু ডাকসু নির্বাচন আর হলো না। যখন যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকলেন, তাঁদের ছাত্রসংগঠন হল দখলে রাখল। প্রশাসন ছিল মূলত পুতুল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর বদল এল। ডাকসু নির্বাচনের আয়োজনও হলো।

ডাকসুতে এবার বড় ছাত্রসংগঠনগুলোর প্রার্থীরা যেমন শক্ত অবস্থানে আছেন, তেমনি সমানতালে লড়াই করছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। প্রার্থীদের ভোট পাওয়ার ক্ষেত্রে বড় বিষয় হয়ে উঠছে, শিক্ষার্থীদের অধিকারের পক্ষে তাঁদের ভূমিকা কী ছিল, সেটা। সংগঠনের বদলে অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পরিচিতিই বড় হয়ে উঠেছে। এ কারণে ছাত্রসংগঠনগুলোও এমন শিক্ষার্থীকে প্রার্থী করেছে, যাঁরা নিজেদের কাজের মাধ্যমে পরিচিত মুখ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আফরোজা জামান ফাহিমা প্রথম আলোকে বলেন, প্রার্থীর দলীয় পরিচয়, তিনি ছেলে নাকি মেয়ে—এসবের আগে দেখতে হবে তিনি কতটুকু কর্মক্ষম। তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান আছে কি না, অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন কি না, মুক্তচিন্তার অধিকারী কি না—এসব দেখতে হবে। শিক্ষার্থীদের কল্যাণে অতীতে তিনি কী করেছেন, এ বিষয়ে অবগত থাকতে হবে।

প্যানেলগুলো তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষার্থীদের প্রায় সব সমস্যা সমাধানের কথা বলেছে। প্রচারে ভোটারদের দ্বারে দ্বারে গেছে। অনলাইনে প্রচার চলেছে তুমুলভাবে (অপপ্রচারও হয়েছে)। এসবই ভোটার আকর্ষণের জন্য। একটি ভোট অনেক মূল্যবান। সেই ভোটটি পেতে প্রার্থীদের চেষ্টার শেষ নেই। এর একটি ভিন্ন দিকও আছে। সেটি হলো, ভোটাররা তাঁদের ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরে যা দেখা যায়নি। তখন জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনে ভোটারের বদলে প্রার্থীরা যেতেন দলের নেতাদের কাছে। বিস্তর টাকা খরচ করতেন। মনোনয়ন পেলেই জয় মোটামুটি নিশ্চিত।

২০১৯ সালের ১১ মার্চ অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে কী হয়েছিল, তা লেখা হয় ১২ মার্চের প্রথম আলোতে। বলা হয়েছিল, সকাল আটটায় ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল সংসদের স্বতন্ত্র প্রার্থীরা অস্বচ্ছ ব্যালট বাক্স খুলে দেখানোর দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু হল প্রাধ্যক্ষ রাজি হননি। এতে শিক্ষার্থীরাও জানিয়ে দেন, তাঁরা ভোট দেবেন না। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ঘটনাস্থলে এসে প্রাধ্যক্ষকে সঙ্গে নিয়ে ব্যালট বাক্সগুলো ভোটকেন্দ্রের পাশের ‘রিডিং রুমে’ (পাঠকক্ষ) নিয়ে যান। পরে সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা বস্তাভর্তি ‘সিল মারা’ ব্যালট উদ্ধার করেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতে ২০১৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে যে কৌশল (আগে ভোট দিয়ে বাক্স ভরে রাখা) নেয়, ২০১৯ সালে ডাকসুতে সেই কৌশল নেয় ছাত্রলীগ। এভাবে ২৫টি পদের মধ্যে ২৩টিতে জয়ী হয়েছিল তারা। শুধু ভিপি (সহসভাপতি) পদে নুরুল হক ও সমাজসেবা সম্পাদক পদে আখতার হোসেন জয়ী হয়েছিলেন ছাত্রলীগের বাইরে।

এবার কি প্রশাসন নিরপেক্ষ

এবারের নির্বাচনে প্রশাসনের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত বড় অভিযোগ নেই। প্রার্থীদের অনেকে ভোট গ্রহণের বুথের সংখ্যা কম বলে উল্লেখ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ৫০০ থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৮১০। ভোট গ্রহণের দিনের আগে-পরে সাত দিন ছুটি দেওয়া নিয়ে বলা হয়েছিল, এতে অনেকে ঢাকার বাইরে চলে যাবেন। প্রশাসন পরে ছুটি বাতিল করেছে। শুধু ভোট গ্রহণের দিন ক্লাস-পরীক্ষা হবে না। ভোট গণনার সময় প্রার্থীদের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি সাংবাদিকদেরও রাখা হবে। আর পুরো গণনা ইলেকট্রনিক পর্দায় দেখানো হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান নিজের কার্যালয়ে গতকাল এই প্রতিবেদককে বলেন, তিনি একটি মাইলফলক তৈরি করতে চান। তাঁদের লুকানোর মতো কিছু নেই।

তবে আজ ভোট গ্রহণ ও ফলাফল ঘোষণা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন না হলে এত দিনের চেষ্টার কোনো মূল্য থাকবে না। ১৯৭৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচনে দিনভর শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ হলেও সন্ধ্যায় বাক্স ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। রাতভর ক্যাম্পাসে গোলাগুলি হয়েছিল। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সেই নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করে। ডাকসুর ইতিহাসে এটি ‘ব্যালট বাক্স ছিনতাই’-এর নির্বাচন হিসেবে পরিচিতি পায়।

ছাত্রদলের প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিমকে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে পেয়ে জানতে চাইলাম, অভিযোগ কী? তিনি বললেন, একজন উপদেষ্টা এক প্রার্থীর পক্ষে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন। তিনি এভাবে পক্ষ নিতে পারেন না। পক্ষপাতের অভিযোগ অন্য প্রার্থীরাও করেছেন।

ভোট হোক নিয়মিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকাল পাঁচ ঘণ্টা ছিলাম। নানাজনের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা সবাই বলেছেন, এবারের ভোটে কোনো প্যানেলের এককভাবে ভালো করার সুযোগ নেই। আবার কে জিতবেন, তা বলা কঠিন। একটি বিষয় নিশ্চিত, জিতবেন আসলে শিক্ষার্থীরা। তাঁরা তাঁদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারবেন।

শিক্ষার্থীরা চান, ডাকসুর ভোট হোক নিয়মিত। যেমন বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আনিকা তামজিদ বলছিলেন, প্রতিবছর একটা নির্দিষ্ট সময়ে ডাকসু নির্বাচন হওয়া উচিত। খুব বেশি চ্যালেঞ্জিং হলে দুই বছর পরপর হতে পারে। তবে এটি অবশ্যই নিয়মিত হতে হবে।

রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রসংগঠনগুলোও এখন বলছে, তারা নিয়মিত ডাকসু নির্বাচন চায়। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পর এটা নিশ্চয়ই বড় পরিবর্তন।

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো